

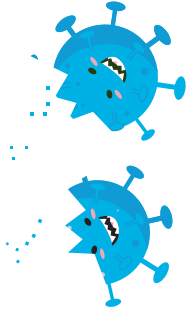
[illegible]

সুখী হতে চান?

অন্যের কল্যাণ করুন

নিজের ভালোলাগার জন্যে সময় অর্থ শ্রম ব্যয় করেন না এমন মানুষ দুর্লভ। এই ভালোলাগার অনুভূতিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয় যখন আমরা অন্যের জন্যে কিছু করি। অন্যের উপকার ও স্বেচ্ছাসেবার মধ্য দিয়ে আসলে আমরা নিজেরই সেবা করি। কথাটির সাথে বিজ্ঞানও একমত। আসুন জেনে নিই অন্যের জন্যে ভালো কিছু করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবনে কী কী পরিবর্তন আসতে পারে—

কমে ভাইরাসজনিত সংক্রমণ ও মৃত্যুর ঝুঁকি



কানাডার একদল হাই স্কুল শিক্ষার্থীকে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে প্রাইমারি পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পড়াতে বলা হয়। চার মাস পর স্বেচ্ছাসেবীদের রক্তে পাওয়া যায় ‘ইন্টারলিউকিন ৬’ প্রোটিনের অস্তিত্ব, ভাইরাসজনিত সংক্রমণ রোধে যা দারুণ কার্যকরী।

আরেকটি গবেষণা বলছে, স্বেচ্ছাসেবায় যুক্ত মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি ২৪% কম। উল্লেখ্য, প্রতিদিন ছয়টির বেশি ফল এবং সবজি খেলে একই অনুপাতে মৃত্যুর ঝুঁকি কমে। এ-ছাড়া স্বেচ্ছাসেবীদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধির হার কম থাকে। রক্তনালীতে প্রদাহের মাত্রা হ্রাস পায় এবং অন্যদের তুলনায় তাদের হাসপাতালেও যেতে হয় কম।

উচ্চ রক্তচাপ থাকে নিয়ন্ত্রণে



কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার কয়েকজন গবেষক একদল প্রবীণের ওপর একটি ব্যতিক্রমী গবেষণা পরিচালনা করেন। প্রবীণ দলকে দু'ভাগে ভাগ করে কিছু অর্থ দেয়া হয়। একদল তা খরচ করে নিজের জন্যে, আরেকটি দল অন্যের কল্যাণে। কয়েক সপ্তাহ পর দুই দলের রক্তচাপ মেপে দেখা যায়, যারা পরার্থে অর্থ ব্যয় করেছেন তাদের রক্তচাপ অন্যদের তুলনায় কম।

মানসিক সুস্থতা ও প্রফুল্লতা হয় নিরবচ্ছিন্ন



অন্যের জন্যে ভালো কিছু করার উদ্যোগটি নিতে পারেন আপনার পরিবার থেকেই। পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্ক দুই পক্ষের মানসিক সুস্থতা, উৎফুল্লতা এবং ইতিবাচকতাকে নিরবচ্ছিন্ন রাখতে সাহায্য করে।

নেতিবাচকতার ক্ষতি সম্পর্কে আপনজনকে যখন আমরা সতর্ক করি, নিজের মস্তিষ্কেও সেটি অটোসাজেশনের মতো তথ্য সরবরাহ করে। যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক বলছেন, মানসিক চাপ মোকাবেলায় অন্যদের সাহায্য করলে আমাদের নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ দক্ষতা এবং মানসিক সুস্থতা বাড়ে।

একাকিত্ব ও জড়তা দূর হয়



স্বেচ্ছাসেবীদের একাকিত্ববোধ তুলনামূলক কম। কারণ এর মধ্য দিয়ে সে বাস্তব সামাজিক যোগাযোগে অভ্যস্ত হয়। বাড়ে মানুষের সাথে মিশতে পারার সক্ষমতা। যোগাযোগ স্থাপনের জড়তা দূর হয়।

শুক্রিয়া ও প্রশান্তি সন্ধান মেলে



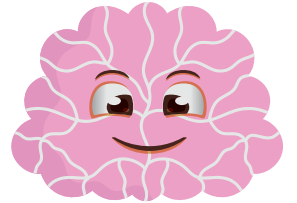
অন্যের দুঃখ লাঘব করতে গিয়ে অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবী নিজের জীবনে আগের চেয়ে বেশি শোকরগোজার হয়ে ওঠেন। অনুভব করেন প্রশান্তি। নিজের দুঃখটা তখন ছোট মনে হয়। কমে আসে অহেতুক অভিযোগপ্রবণতাও।

সঙ্গীর যত্নে বাড়ে নিজের আয়ু



তিন সহস্রাধিক প্রবীণ দম্পতির ওপর পরিচালিত একটি বড় পরিসরের গবেষণায় দেখা গেছে, যারা সপ্তাহে অন্তত ১৪ ঘণ্টা পরস্পরের সেবায়ুক্ত করেন তারা দীর্ঘায়ু হন।

দূর হয় অস্থিরতা বিষণ্ণতা



গিভ এন্ড টেক : অ্যা রেভলিউশনারি অ্যাপ্রোচ টু সাকসেস বইয়ের লেখক ও মনোবিজ্ঞানী অ্যাডাম গ্রান্টের মতে, দুষ্কিন্তারোধী ওষুধগুলোর মধ্যে একটি হলো অন্যের প্রতি সমমর্মিতা। একাধিক গবেষণা বলছে, যে দিনগুলোতে আমরা দান করি বা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করি বা অন্যের কল্যাণ চিন্তা করি, সেই দিনগুলোতে শরীরে স্ট্রেস হরমোন কর্টিসলের মাত্রা কম থাকে।

তথ্যসূত্র :
বিবিসি ফিউচার, ১৬ ডিসেম্বর ২০২০
সাইকোলজি টুডে, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস, ৯ এপ্রিল ২০২০
সাইকোলজি টুডে, ৩০ মে ২০১৮

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে দৃষ্ট পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সমৃদ্ধির এই সুফল সর্বস্তরের মানুষ তখনই পাবে, যখন অর্থনীতির পাশাপাশি নৈতিক ও মানবিক গুণেও অনুসরণীয় হয়ে উঠবে আমরা। এজন্যে প্রয়োজন শুদ্ধাচার চর্চা। এ-ক্ষেত্রে ছোট-বড় নির্বিশেষে পরিবারের সবার জন্যে সহায়ক হবে ‘শুদ্ধাচার’ বইটি। স্বাধীনতার মাসে আসুন জেনে নিই দেশপ্রেমিক হিসেবে অনুসরণীয় শুদ্ধাচারগুলো—

ছোট ছোট ভালো কাজ

বদলে দেবে সমাজ



যখনই এবং যেখানেই জাতীয় সংগীত বাজবে—দাঁড়িয়ে সম্মান জানান এবং পুরো সময় দাঁড়িয়ে থাকুন। একসাথে গাইতে থাকুন বা মৌন থেকে শুনুন। জাতীয় সংগীত চলাকালে গল্প করবেন না, রসিকতা ও হাসাহাসি করবেন না। অন্য দেশের জাতীয় সংগীতকেও একইভাবে সম্মান করুন। কখনোই ব্যঙ্গ করবেন না, মন্তব্য করবেন না।

বাঙালির চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিজের মধ্যে লালন করুন। ধর্ম-বর্ণ-অঞ্চল নির্বিশেষে সব মানুষকে সমমর্যাদা প্রদান করুন।

জাতীয় স্থাপনাসমূহের চত্বরে কোনো ময়লা ফেলবেন না। স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনারসহ সকল জাতীয় স্থাপনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সহযোগিতা করুন।

হই-হুল্লোড়, উচ্চস্বরে গান বাজানো, আড্ডা দেয়াসহ যে-কোনো ধরনের অমার্জিত-অশ্লীল কাজ ও আচরণ থেকে জাতীয় স্থাপনাসমূহকে মুক্ত রাখুন।

দেশপ্রেম হোক আপনার প্রতিটি কাজের প্রধান মানদণ্ড। কাজ করার আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, কাজটি দেশ ও দেশের মানুষের জন্যে কল্যাণকর, না ক্ষতিকর? কল্যাণকর হলে কাজটি করুন। আর ক্ষতিকর হলে সে-কাজ করা থেকে বিরত থাকুন।

অন্য দেশে ভ্রমণের সময় দৃষ্টিনন্দন বা ভালো কিছু দেখে নিজের দেশের কোনোকিছুর সাথে নেতিবাচক তুলনা করবেন না। অন্যত্র ভালো যা-কিছু দেখলেন ও শিখলেন, তা কাজে লাগিয়ে নিজের দেশ গড়ায় মনোনিবেশ করুন।

শুদ্ধ উচ্চারণে বাংলা বলুন। অন্য ভাষার সাথে মিলিয়ে ভাষার জগাখিঁচুড়ি বানানো মাতৃভাষার জন্যে অসম্মানজনক।

সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই—বিশেষত ইংলিশ মিডিয়াম/ ভার্সনে পড়লেও শুদ্ধ বাংলায় কথা বলা ও লেখা শেখাতে সচেতন থাকুন। মাম্মি-ড্যাডি নয়, মা-বাবা অথবা আম্মা-আব্বা; আন্টি-আংকেল নয়, চাচা-চাচী/ মামা-মামী/ খালু-খালু/ ফুপা-ফুপু ডাকতে উদ্বুদ্ধ করুন।

দেশকে ভালবাসুন। সবসময় মনে রাখুন— নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করাই প্রকৃত দেশপ্রেম।



ফ্রি পিডিএফ

অনলাইনে পড়ুন



কোয়ান্টাম বুলেটিন ৯ মার্চ ২০২২

দেশের জন্যে কিছু করতে পেরেছি, এটাই বড় পাওয়া শাহীন সামাদ

দেশের জন্যে কিছু করব বলে ১৯৭১ সালে যখন ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম, আমার বয়স তখন ১৮ বছর। সদ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি।

আগরতলা হয়ে কলকাতায় যাছি। আমি বোরকায় মুখ ঢেকে বসে আছি, পাশে আমার স্বামী। চান্দিনা নামক জায়গাটা রিকশায় চড়ে যখন পার হচ্ছি, হঠাৎ পাকিস্তানি আর্মির একটা জিপ এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। দুজন সৈন্য রাইফেল হাতে নেমে এলো। তারা জানতে চাইল, কোথায় যাছি। আমার স্বামী জবাব দিলেন—‘স্বশুরবাড়ি যাচ্ছি!’ একজন এগিয়ে এসে আমার মুখের কাপড় সরাতে উদ্যত হলো। আমি ভীষণ ভয় পেলাম। কী মনে করে অন্য সৈন্যটি বলল, ‘থাক্, ছেড়ে দাও।’

আজও সেই স্মৃতি মনে হলে শিউরে উঠি। সেদিন যদি ধরা পড়তাম, তাহলে হয়তো আমার পরিচয়টা আজ অন্যরকম হতো!

স্বাধীনতার গান নিয়ে নিরন্তর পথচলা

কলকাতায় গিয়ে খবর পেলাম, লেনিন সড়কে একটা গ্রুপ হয়েছে—‘বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থা’। আমরা ওদের সাথে যুক্ত হলাম।

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী বহু জায়গায় আমরা ঘুরে ঘুরে গান গেয়েছি। যা টাকা পেতাম, সব তুলে দেয়া হতো মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীরা আমাদের সর্বাঙ্গিকভাবে সাহায্য করেছেন! তাদের মধ্যে যিনি সবসময়

ছায়ার মতো আমাদের সাথে থাকতেন এবং সব অনুষ্ঠান আয়োজন করে দিতেন, তিনি হলেন পঙ্কজ সাহা।

প্রতিদিন আমরা শরণার্থীদের বিভিন্ন ক্যাম্পে যেতাম, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে যেতাম এবং গান গাইতাম। আমরা গান গেয়ে মানুষের মনোবল বাড়াতে চেষ্টা করেছি—সাহস দিতে চেষ্টা করেছি যে, তোমরা ভয় পেও না, আমাদের দেশ একদিন স্বাধীন হবে, আমরা ভয় পেও না, আমাদের দেশ একদিন স্বাধীন হবে, আমরা আবার দেশে ফিরব। আমাদের একটাই খাবার ছিল—সিঙ্গাড়া। দিনে একটা বা

দুটো সিঙ্গাড়া, ব্যস এটুকুই। দলে সবার চেয়ে বয়সে ছোট ছিল বিপুল ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালে পল্লীসংগীতের খ্যাতনামা শিল্পী)। কোথাও যখন একটা সিঙ্গাড়া দিত, বিপুল হয়তো আরেকটা চাইত। কিন্তু কোথা থেকে দেবে? কারো কাছেই খাবার নেই।

কোথাও খাবার পেতাম, কোথাও-বা পেতামই না। কিন্তু আমাদের ভেতরে আশ্চর্য এক মনোবল ছিল। এমনও হয়েছে, ১০-১২ দিন ধরে আমরা পাটশাক সেদ্ধ খেয়েছি। কিন্তু ভেতরে একটা স্পিরিট সবসময় ছিল যে, আমাদের দেশ স্বাধীন হবে এবং আমরা দেশের জন্যে কাজ করছি।

সময়ের সাক্ষী : মুক্তির গান

আমরা যখন ক্যাম্পগুলোতে গান করছিলাম তখন মার্কিন চলচ্চিত্রকার, আলোকচিত্রী ও সাংবাদিক লিয়ার লেভিন বেশ কিছু ভিডিও ফুটেজ নিয়েছিলেন।



মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠসৈনিক শাহীন সামাদ। বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রামী শিল্পী সংস্থার অন্যতম সদস্য।

সেগুলো ১৯৭১-এর পর তার বাড়ির বেজমেন্টেই পড়ে ছিল। তারেক মাসুদ (পরবর্তীকালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও একুশে পদকে ভূষিত প্রয়াত চলচ্চিত্র পরিচালক) ও ক্যাথরিন মাসুদ ২৪ বছর পর অনেক চেষ্টায় লিয়ার লেভিনকে খুঁজে বের করলেন। ৩০ ঘণ্টার ফুটেজ থেকে ১ ঘণ্টা ১৪ মিনিটের একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। সেটাই ‘মুক্তির গান’।

দীর্ঘদিন পড়ে থাকা ভিডিও টেপগুলোতে ফাঙ্গাস পড়ে গিয়েছিল। অনেক শ্রম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে তারেক মাসুদ দম্পতি নির্মাণ করেন ‘মুক্তির গান’। এর খরচ জোগাতে ওদের বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছিল!

তারা যদি এ উদ্যোগটি না নিতেন, তাহলে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের এই ইতিহাস একসময় হারিয়েই যেত। কেউ জানতই না যে, আমরা মুক্তিযোদ্ধা! জীবনে এটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া যে, দেশের জন্যে কিছু করতে পেরেছি।

লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রয়োজন সাধনা ও পরিশ্রম

আজ আমি যে অবস্থানে আছি, তা আমার গুরুদের অবদান। আমি যেখানেই গান করতে যাই বা শেখাতে যাই, আমার শিক্ষকদের স্মরণ করি, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সবসময় শিক্ষকদের স্নেহময় সান্নিধ্য পেয়েছি।

১৯৬৬ সাল থেকে আমি ছায়ানটের সাথে যুক্ত। গান শেখায় বা অনুশীলনে কখনো ফাঁকি দিয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না। সেইসাথে দৈনন্দিন জীবনে মেডিটেশন চর্চা আমাকে অনেক স্থির হতে সাহায্য করেছে।

আমি বিশ্বাস করি, লক্ষ্যে পৌছতে হলে সাধনা এবং পরিশ্রমের প্রয়োজন। সেইসাথে ভাবতে হবে দেশের কথা দশের কথা। শেখার জন্যে মনটাকে সবসময় উন্মুক্ত রাখতে হবে। যিনি যে কাজ করছেন সে কাজটাই সবচেয়ে আন্তরিকতা নিয়ে সৎভাবে করলেই আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাব।

অনেক শ্রম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে তারেক মাসুদ দম্পতি নির্মাণ করেন ‘মুক্তির গান’। তারা যদি এ উদ্যোগটি না নিতেন, তাহলে হয়তো মুক্তিযুদ্ধের এই ইতিহাস একসময় হারিয়েই যেত। কেউ জানতই না যে, আমরা মুক্তিযোদ্ধা!

সমমর্মিতা ও আত্মদানে পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা মফিদুল হক

১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে রবিশঙ্কর ও জর্জ হ্যারিসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’। একই দিনে লন্ডনের ট্র্যাফলগার স্কয়ারে আরেকটি বড় আয়োজন হয়েছিল আমাদের দেশের যুদ্ধাহত মানুষদের সহায়তায়। এর নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ‘অপারেশন ওমেগা’ এবং ‘আকশন বাংলাদেশ’ নামে দুটো আন্দোলন। দুটোর সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন ব্রিটিশ দম্পতি পল কনেট ও ইলেন কনেট।

ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া এক আখ্যানের খোঁজে

১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজের সূত্রে মুক্তিযুদ্ধে পল ও ইলেন কনেটের অবদান সম্পর্কে নানা তথ্য পাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনোভাবেই তাদের সন্ধান পাচ্ছিলাম না। এরও পাঁচ-ছয় বছর পর সাবেক সেনাপ্রধান লে. জে. (অব.) হারুন-উর-রশিদ কানাডা থেকে ফিরে একদিন কথায় কথায় বললেন, টরন্টো থেকে অটোয়া যাওয়ার পথে ট্রেনে পল কনেট বলে এক ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হয়েছে, যিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলার মানুষের জন্যে কাজ করেছেন।

অবিস্বাস্যভাবে আমরা পেয়ে গেলাম সেই মানুষটিকে। তার কাছ থেকে আরো পেলাম মুক্তিযুদ্ধের দুর্লভ অনেক ছবি, স্লাইড এবং সে-সময় লেখা তার ডায়েরি।

১৯৭১ সালে পল ও ইলেন ছিলেন সদ্য বিবাহিত দম্পতি। ট্র্যাফলগার স্কয়ারে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে তারা দুটো অ্যাম্বুলেন্স কেনেন এবং এদেশের মানুষকে সাহায্য করতে চলে আসেন। প্রথমে সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন তারা। তারপর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের সাথে পল কনেট ঢুকে পড়লেন ফরিদপুরে।

অন্যদিকে তার স্ত্রী ইলেনও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যে অনেক ওষুধপত্র নিয়ে নৌকায় করে চলে আসেন যশোরের ঝিকরগাছায়। কিন্তু ধরা পড়ে যান পাকিস্তানি আর্মির হাতে। আগস্টের শেষ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হয় যশোর জেলখানায়। সেখানে গিয়েই বুঝতে পারেন তিনি সন্তানসম্ভবা! ৭ ডিসেম্বর যশোর মুক্ত হলে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তারা সন্তানের নাম রাখেন অ্যালেন মুজিব কনেট।

নতুন প্রজন্ম জানুক তার শেকড় সম্পর্কে

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকার পল কনেট ও ইলেন কনেট-কে ‘ফ্রেন্ডস অব লিবারেশন ওয়ার’ সম্মাননায় ভূষিত করেন। ইলেনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম—প্রথম সন্তান গর্ভে অথচ তিনি জেলখানায়, কেমন ছিল সেই অনুভূতি। অবাক হয়ে দেখলাম, তার মধ্যে কোনো অভিযোগ নেই। আসলে নিপীড়িত মানুষের জন্যে এমন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করার সামর্থ্য তখনই আসে, যখন মানুষ তার ভেতরের শক্তিকে উপলব্ধি করে।

এমনই অনেক মানুষের আত্মত্যাগের অজানা কাহিনী সংরক্ষিত আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভে। এজন্যেই আমরা চাই নতুন প্রজন্ম সম্পৃক্ত হোক জাদুঘরের সঙ্গে। জানুক তার শেকড় সম্পর্কে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে অনন্য উদ্যোগ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যাত্রা শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। সেটা ছিল স্বাধীনতার ২৫ বছর। আমরা কিছু সমমনা মানুষ ভাবলাম—মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের একটি উদ্যোগ নিই এবং মানুষের কাছে আবেদন জানাই।



মফিদুল হক। লেখক-গবেষক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

শুধু প্রতিশ্রুতি না দিয়ে আগে নিজেরা মিলে দৃশ্যমান কিছু গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সেগুনবাগিচায় একটা ভাড়া বাড়িতে শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের কাজ। গণমাধ্যম বিশেষভাবে সহায়তা করল। যে সাড়াটা আমরা মানুষের কাছ থেকে পেলাম তা অতৃতপূর্ব। মানুষের সহায়তাই এটাকে সম্ভব করে তুলেছে। এজন্যে আমরা বলি—ইটস অ্যা প্রাইভেট ইনিশিয়েটিভ বাট ইটস অ্যা পিপলস মিউজিয়াম।

একসময় আমাদের মনে হলো, একটি স্থায়ী জাদুঘর করা প্রয়োজন। ২০০৮ সালে সরকারিভাবে আগারগাঁওয়ে এক একর জায়গা আমাদের বরাদ্দ দেয়া হলো। জাদুঘর যেন তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারে, সে উদ্দেশ্যে আমরা সরকারি মূল্যে জায়গাটা ক্রয় করি। এই টাকা আমরা নানাভাবে সংগ্রহ করেছিলাম। শিল্পীরাও অনেক সহায়তা করেছেন।

নির্মাণ ব্যয়ের ১০০ কোটি টাকার মধ্যে ৫৫ কোটি টাকা সরকারের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি এবং ৪৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছি দেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। সবার সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, যেভাবে সম্ভব হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ।

পারম্পরিক সমমর্মিতাই আমাদের শক্তির উৎস

একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তোলাই ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূল্যবোধ। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, কোয়ান্টামও এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার কথাই বলে। কোয়ান্টামের মূল ভিত্তি হলো মানুষের ভেতরের শক্তিকে জানা, বোঝা এবং জাহত করে তোলা। এই শক্তিটা উৎসারিত হয় অপরের প্রতি সমমর্মিতা এবং সমাজের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা থেকেই।

এই সমমর্মিতা ও বিপুল আত্মদানের মধ্য দিয়েই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বহু পরিবারের সন্তানের রক্ত শহিদের রক্ত হয়ে মিশে গেছে এ মাটিতে। এরকম একটা রক্তের উত্তরাধিকার নিয়ে আমাদের দেশটার জন্ম। একে যেন আমরা রক্ষা করতে পারি—এই হোক আমাদের প্রত্যয়।



কারো বিপদ দেখলে আমি তার পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করি। কিন্তু আত্মীয়স্বজনের কাছে প্রায়ই শুনতে হয় যে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছি। তখন খরাপ লাগে। মনে দ্বিধা চলে আসে। আবার উপকার না করে থাকতেও পারি না। সত্যিই কি আমি ভুল করছি?

উত্তর : আসলে যারা অন্যের প্রয়োজনে এগিয়ে গেছেন, নিজের চাহিদাকে একটু সীমিত করে অন্যের প্রয়োজনকে বড় করে দেখেছেন—সব কালেই আশেপাশের লোকজন তাদেরকে কখনো ভুল বুঝেছে, কখনো ভর্তসনা করেছে, কখনো বিরোধিতা করেছে, এমনকি স্বার্থে আঘাত লাগলে আক্রমণ করতেও ছাড়ে নি! কিন্তু তারা কি দমে গেছেন? কখনো জীবদ্দশায়, কখনো-বা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তারা কি কিছু চিরস্মরণীয় হয়েছেন।

অতএব কারো উপকার করতে মনে কখনো কোনো দ্বিধা রাখবেন না।



বিভিন্ন সময় আমি যাদের উপকার করেছি, আমার প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতা সেভাবে পাই নি। তবে যে-কোনো সমস্যা থেকে তাদের সাহায্য ছাড়াই আমি ঠিক রক্ষা পেয়ে যাই! তারপরও সেই মানুষগুলোর প্রতি বিরক্তি কাজ করে। আমার করণীয় কী?

উত্তর : তাদের প্রতি বিরক্তি পুষে রাখবেন না। এটাই আপনার করণীয়। আর আপনি যে অন্যের কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেন, তার বরকতেই যে-কোনো সমস্যায় আপনি রক্ষা পেয়ে যাচ্ছেন। এটাই আপনার ওপর আল্লাহর রহমত।

আসলে এটাই বাস্তবতা। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সেও তো আমরা বলি—আপনি যাদের উপকার করবেন, সম্ভাবনা হচ্ছে তারা আপনার উপকার নয় বরং নিন্দা করবে। কিন্তু আপনার যখন সাহায্য প্রয়োজন, তখন কেউ না কেউ এসে আপনার পাশে দাঁড়াবে। এটাই প্রকৃতির প্রতিদান।

তাই যাদের উপকার করলেন তাদের ওপর নয়, সবসময় ভরসা রাখবেন আল্লাহর ওপর। সেইসাথে যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজের দিক থেকে সর্বোচ্চটুকু করবেন।



বন্ধুরা মিলে নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ নিয়েছি। উৎসাহী অনেককেই যেমন পেয়েছি তেমনি নিরুৎসাহিত করার মানুষেরও অভাব নেই। তাদের কথা হলো—‘এসব চিন্তা বাদ দিয়ে পড়ায় মন দেয়া উচিত। রেজাল্টটাই আসল। কারণ আপনি বাঁচলে বাপের নাম’। আমার কী করা উচিত?

উত্তর : যে-কোনো উদ্যোগ নিলে আপনি সবসময়ই উৎসাহী ও নিরুৎসাহী দুই দলকেই পাবেন। কাজটা যদি নিজের ও সমাজের জন্যে কল্যাণকর হয়, তবে উৎসাহীদের নিয়ে শুরু করে দেয়াটাই কর্তব্য। চারপাশে যে-সব উদ্যোগ দেখে আমরা প্রশংসা করি, হাততালি দেই—সব এভাবেই হয়েছে!

আর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজটি মনোদৈহিকভাবে আপনাকে আরো উদ্যমী ও পরিশ্রমসহিষ্ণু করে তুলবে। আপনার লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে তাহলে এর সুফল আপনি আপনার পড়াশোনা ও রেজাল্টেও পাবেন।

‘আপনি বাঁচলে বাপের নাম’ নীতিতে চলার মানুষ সবসময় সব জায়গাতে কিছু থাকবে। এদের কথা শুনে দমে যাওয়ার কিছু নেই। প্রথমত, আপনাকে দমানোর জন্যেই এরা এসব বলে। দ্বিতীয়ত, সে যে অন্যের জন্যে কিছুই করছে না বা করতে পারছে না, সেই কষ্ট থেকে আপনার কাজটাও তার কাছে অসহনীয়। আর এদের রেজাল্ট যেমনই হোক, শেষপর্যন্ত এদের প্রায় কেউই সমাজের কোনো কাজে লাগে নি।

আপনার প্রশ্ন গুরুজীর উত্তর



কোয়ান্টাম কোর্স করেছি চার বছর আগে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ১০ দিনের ছুটিতে লামায় খেদমতায়নে গিয়েছিলাম। সেখানে প্রবীণ সেবায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। অসহায় প্রবীণদের জন্যে কিছু করতে পেরে খুব তৃপ্তি পেয়েছি। তবে ঢাকায় ফিরে বার বার মনে হচ্ছে, আমাদের দেশে এত অসহায় মানুষ! আমরা তাদের জন্যে কতটুকুই-বা করতে পারছি? এক ধরনের হতাশা কাজ করছে।

উত্তর : প্রথমেই আপনাকে অভিনন্দন, ১০ দিনের ছুটিতে আপনি খেদমতায়নে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে ভালো সিদ্ধান্ত। পরিশ্রম ও সেবার মধ্য দিয়ে কাটানো এ সময়টা ইতোমধ্যেই আপনার শরীর-মনে একটা ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছে, যা টোটাল ফিটনেস অর্জনের পথে আপনাকে বেশ কিছুটা এগিয়ে দিয়েছে, সেটা নিশ্চয়ই আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন।

অথচ সময়টা আপনি ফেসবুক-ইন্টারনেটের অলীক জগতেও নিক্রিয় কাটিয়ে দিতে পারতেন, সে-ক্ষেত্রে বাড়ত আপনার বিষণ্ণতা-অসুস্থতার সম্ভাবনা। এই ভার্য্যাল ভাইরাস আসক্তি কাটানোর জন্যেও লামা খেদমতায়ন কার্যকর।

অসহায় প্রবীণদের সেবা করে তৃপ্তি পেয়েছেন, তাই আপনাকে পুনরায় অভিনন্দন। আসলে আজ যারা প্রবীণ, তাদের শ্রম, ঘাম, অবদানের ওপর ভিত্তি করে সমাজ ও সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সেবা করা, প্রয়োজন পূরণ করা—এটা কিন্তু তাদের প্রতি করুণা নয়; বরং আমাদের ওপর এটা তাদের হক বা অধিকার।

ঢাকায় ফিরে আপনার যে আকৃতি, দেশের আরো অসহায় মানুষদের জন্যে আপনার যে কষ্ট, এই অনুভূতিকে আমরা সম্মান জানাই। তবে সবটা তো কেউ একা করতে পারবে না, সেটা সম্ভবও নয়। আপনার সাধের সর্বোচ্চটা যদি আপনি করতে পারেন, সেটাই আপনার সার্থকতা।

আর একা যা করা যায় না, সেটা করার জন্যেই তো সজ্জ। কোয়ান্টাম তো গত দুয়ুগেরও বেশি সময় ধরে সেবার কাজটিই সজ্জবদ্ধভাবে করে আসছে।

সামর্থ্য যখন আরো বাড়বে, তখন ইনশাআল্লাহ আরো বড় পরিসরে আমরা সেবা দিতে পারব। তখন আপনার এই হতাশা আর আক্ষেপগুলো থাকবে না। সে লক্ষ্যেই তো আমরা কাজ করে যাচ্ছি।



কোয়ান্টামের একটি প্রোগ্রামে শুনলাম, দাতা এবং দান সংগ্রহকারী আল্লাহর কাছে সমান মর্যাদার। আমি নিজে নিয়মিত দান করি। কিন্তু পরিচিতদের দান করার কথা বলতে সংকোচ কাজ করে। তারা যদি ভাবে আমার স্বার্থ আছে বলেই তাকে বার বার দান করার কথা বলছি—এসব চিন্তা মাথায় আসে। দয়া করে পরামর্শ দেবেন, কীভাবে আমি আত্মবিশ্বাসের সাথে অন্যকে দানে উদ্বুদ্ধ করব?

উত্তর : সংকোচ-সংশয় এলেই মনে করবেন, দানের অর্থটা আপনি আপনার দরকারে নয়; বরং অসহায়-বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে সংগ্রহ করছেন। এ-ছাড়াও আপনার সংগৃহীত অর্থ দিয়ে কোথায় কী হচ্ছে, কোন কাজে ব্যয় হচ্ছে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলেও আপনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন।

এ-ছাড়াও সত্য হচ্ছে, সমালোচনা থাকবেই। যিনি কাজ করেন, সমালোচনা তারই হয়। কাজ নেই তো সমালোচনাও নেই।

আর হ্যাঁ, স্বার্থ তো আপনার একটা আছেই! আপনি নিজে দান করছেন, দান সংগ্রহ করছেন, কারণ আপনি চারপাশের মানুষ ও সমাজের কল্যাণ চান। এটাও একটা স্বার্থ, তবে উচ্চতর স্বার্থ।

ভালো কাজ শুরু করুন যে-কোনো বয়সে

কোনো বাধাই আদতে বাধা নয়

ভালো কাজ বা সেবামূলক কাজ নিয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে কিছু ভুল ধারণা ও মনোভাব। প্রথমত, এসব করার জন্যে একটা নির্দিষ্ট বয়স এবং সময় রয়েছে। এই যেমন : ছেলেমেয়ের বিয়ে দিয়ে, চাকরি থেকে অবসর নিয়ে, ব্যবসা একটু গুছিয়ে নিয়ে না-হয় ভালো কাজ করা যাবে। আগে তো বয়সীানের খাতায় নাম উঠুক! তারপর না-হয় ভালো কাজ করব।

দ্বিতীয়ত, সেবামূলক কাজের ‘বিলাসিতা’ শুধু ধনীদেবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ নিম্ন বা মধ্যম আয়ের মানুষ তাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে সংকর্মে ইচ্ছা থাকলেও অংশ নিতে পারেন না।

তৃতীয়ত, শিশুদের এসব কাজে যুক্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা এসব বুঝবে না। তাদের শুধু লেখাপড়াতে মনোযোগী হতে হবে।

ওপরের সব কটি ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অনেকের ক্ষেত্রেই শেষ বয়সে গিয়ে ভালো কাজ করা আর হয়ে ওঠে না। সাংসারিক দায়িত্ব-কর্তব্যের চাকা চক্রাকারে চলতে থাকে। ধীরে ধীরে শরীরের শক্তি কমতে থাকে, কমে মনের জোরও। শুরু হয় ডাক্তার-বদ্যির পেছনে ছুটোছুটি। অন্যদিকে, যার যার সাধ্যমতো ভালো কাজ করায় আছে আত্মার তৃপ্তি, প্রাণের আনন্দ।

বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র শ্রীলংকা এবং ইন্দোনেশিয়া স্বেচ্ছাসেবায় অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। সেবামূলক কার্যক্রম নিয়ে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় জরিপ পরিচালনা প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের ‘চারিটিজ এইড ফাউন্ডেশন’ ওয়ার্ল্ড গিভিং ইনডেক্স (ডব্লিউজিআই)-এর রিপোর্টে ২০০৯-২০১৮ সালের সম্মিলিত হিসেবে বিশ্বের প্রথম ১০টি দানশীল জাতির তালিকায় স্থান পেয়েছে শ্রীলংকা এবং ইন্দোনেশিয়া।

চাই শুধু সদিচ্ছা আর একটু সমন্বয়

শুধু তা-ই নয়, স্বেচ্ছাশ্রমে অংশগ্রহণের দিক দিয়ে শ্রীলংকার স্থান বিশ্বে প্রথম (শতকরা ৪৬ জন) এবং ইন্দোনেশিয়ার স্থান সপ্তম (শতকরা ৪০ জন)। যা প্রমাণ করে দাতা হওয়ার সাথে বিত্ত-বৈভবের কোনো সম্পর্ক নেই। সদিচ্ছা এবং তার বাস্তবায়নই যথেষ্ট।

অর্থাৎ একটু সমন্বয় করে চলতে পারলেই জীবন হয়ে উঠতে পারে অনেক বেশি অর্থবহ। তার মানে সেবামূলক বা ভালো কাজের জন্যে দিন-ক্ষণ-মাসের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। শ্রেণি, পেশা, আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে প্রায় সব মানুষই যে-কোনো মুহূর্তে ভালো কাজ শুরু করতে পারেন।

শৈশব থেকে শুরু করতে পারলে তো আরো ভালো। অবশ্য এজনে পারিবারিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ জরুরি। মা-বাবাকে ভালো কাজ করতে হবে এবং সন্তানদের শেখাতে হবে। উৎসাহ দিতে হবে।

উত্তর আমেরিকায় শিশুরা যখন প্রি-স্কুলে যায়, তখন থেকেই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবায় সংযুক্ত হওয়া তাদের লেসন-প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত। ভলান্টারি কাজের সাথে যুক্ত থাকাটা হাই স্কুল বা কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় বিশেষ যোগ্যতা বলে বিবেচিত হয়। মা-বাবাও সন্তানদের শিশু বয়স থেকে বিভিন্ন কমিউনিটি কার্যক্রমে নিয়ে যান। কর্মজীবনে প্রবেশের সময়েও এই ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। শৈশবে কচি মনে যে বীজ রোপিত হয়, তা পত্রপুষ্পে বিকশিত হতে থাকে সারা জীবন ধরেই।

আপনিও পারবেন

দেরি না করে এখনই শুরু করুন। কাজে পরিণত না করে মনে পুষে রাখা সদিচ্ছার তেমন কোনো মূল্য নেই। তার চেয়ে ছোট্ট একটা ভালো কাজ অনেক বেশি আনন্দের, পুণ্যের তো অবশ্যই।



ধ্যানঘর বদলে দিল একটি জনপদ



১৯৯৯ সালের এপ্রিলে পাহাড়ি স্থাপত্যে নির্মিত প্রথম ধ্যানঘর। ২০০২ সালে তোলা ছবি

১৯৯৯ সালে বান্দরবান লামার দুর্গম অঞ্চলে কোয়ান্টামের উদ্যোগে নির্মিত হয় প্রথম ধ্যানঘর। প্রকৃতির সান্নিধ্যে ধ্যানীরা যেখানে খুঁজে পান প্রশান্তি ও আত্ম-আবিষ্কারের অনন্য অনুভূতি। ধ্যানঘর নির্মাণের পর এখানে সারাদেশ থেকে সমবেত হতে থাকেন ধ্যানীরা।

সময়ের সাথে সাথে এই ধ্যানঘরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ‘কোয়ান্টামম’। বিস্তার লাভ করে কোয়ান্টামের নানান সেবা কার্যক্রম। ২০০৪ সালে ধ্যানঘর পুনর্নির্মিত হয় আরো বেশি সংখ্যক ধ্যানীকে একসাথে ধ্যানচর্চার সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে।

দুই যুগ আগে এই জায়গাটি ছিল দেশের সবচেয়ে সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলগুলোর একটি। দুবেলার খাবার জোটাতে স্থানীয় অধিবাসীদের করতে হতো অবর্ণনীয় সংগ্রাম। পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে আমূল। স্থানীয় বাজারে বসেছে একাধিক স্বর্ণের দোকান! চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের শহরে অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা এখানে এসে ব্যবসা করছেন অধিক লাভের আশায়।

এ অঞ্চলের পুরো জনপদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে এই একটি কুঁড়েঘর। সময়ের প্রয়োজনে একে পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এ দূরপ্রসারী উদ্যোগে আপনিও সাধ্যমতো অংশ নিন। হোন বড় পরিবর্তনের নেপথ্যে নায়ক।

নির্মিতব্য ধ্যানঘরের ৩ডি আলোকচিত্র

নতুন ধ্যানঘর নির্মাণে আপনিও এগিয়ে আসুন সময়, শ্রম ও অর্থ নিয়ে



কোয়ান্টাম বুলেটিন



কোয়ান্টাম প্রকাশনা
ফ্রি ডাউনলোড

মার্চ ২০২২ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইভোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা
Phone : 222221441, 222225756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd